



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 801 - 805

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

আদিবাসী সমাজের লোকবিশ্বাস ও গাথা পরিচয়

মিনতি হাঁসদা

সহকারী অধ্যাপক, বিদ্যানগর কলেজ

Email ID: minatihansda276@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Abstract

Discussion

উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সমাজে সূর্যগ্রহণ, বিশ্বাস, মৌখিক ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের বিষয়ে অনেকেরই ধারণা আছে, আবার অনেকেরই সে ধারণা নেই। এদেশের মাটির গভীরে কান পেতে আদিবাসী সমাজকে বুঝতে হয়, জানতে হয় তাদের জীবনবোধ, তাদের সংস্কৃতি, তাদের গান ও জীবনের ধারাপাত। বলাবাহুল্য, আদিবাসী সমাজকে বুঝতে হলে তাদের বিশ্বাস, লোককাহিনি ও আচার অনুষ্ঠানের দিকে গভীরভাবে তাকাতে হয়। এই সমাজগুলো মূলধারার লিখিত ইতিহাসের বাইরে দাঁড়িয়ে মৌখিক স্মৃতি ও লোকগাথার মাধ্যমে নিজেদের অতীতকে ধারণ করে রেখেছে। নিজেদের অতীত ঐতিহ্যের ধারা বহন করবার মানসিকতা বজায় রেখেছে। প্রকৃতি, মানুষ ও দেবতার সম্পর্ক এখানে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সংযোগ স্থাপন করে আছে। সূর্য গ্রহণের মতো একটি প্রাকৃতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই সম্পর্ক সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। দিনাজপুর অঞ্চলের বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনে সূর্যগ্রহণ কেবল জ্যোতির্বিজ্ঞানিক ঘটনা নয়, এটি সামাজিক সংহতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক।

“আসলে সংস্কৃতি বিকাশের যে একটা বিশ্বজনীন নিয়ম আছে এবং সেই নিয়মেরই বিভিন্ন ধাপে দাঁড়িয়ে আছেন বেশি-অগ্রসর, কম-অগ্রসর এবং আরও কম অগ্রসর সংস্কৃতিসম্পন্ন বিশ্বের সমস্ত জাতি-অধিজাতিরা-সেটা একশো বছর আগেই আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ লুইস হেনরি মর্গ্যান প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। পশ্চিম সমাজবিজ্ঞানীদের একটা খুব বড় অংশই অবশ্য তাঁর তত্ত্বের নানান টুকটাকি খুঁত খুঁজে বার করে সেটিকে মানতে বিমুখ হন-আর নয়তো একেবারেই সেটার অস্তিত্ব সম্পর্কে অনবহিত থাকার ভান করেন!”^১

শহুরে জীবনে সূর্যগ্রহণ আজ বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যাত একটি ঘটনা মাত্র। মানুষ মোবাইল ফোন বা টেলিভিশনের মাধ্যমে গ্রহণ দেখে, আবার অনেকে একে সম্পূর্ণ উপেক্ষাও করে। কিন্তু দিনাজপুর শহর পেরিয়ে আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে প্রবেশ করলে বোঝা যায়, সূর্যগ্রহণ এখানে জীবনের বিরাট বড় একটা বিষয়। সূর্য গ্রহণের সঙ্গে এই সমাজের বহুল ধ্যান ধারণা জড়িয়ে রয়েছে। ঢোল-মাদলের শব্দ, ধূপের ধোঁয়া ও মানুষের সমবেত কণ্ঠে গ্রাম যেন এক ভিন্ন জগতে রূপ নেয়। কড়া জনগোষ্ঠীর মানুষজন তখন একযোগে আকাশের দিকে তাকিয়ে আত্মস্থান জানায়, “মামা, গাহানা ছাড়া!”^২ এই আত্মস্থান

কেবল সূর্যের উদ্দেশে নয়, বরং মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার এক আকুতি। সকলের কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা ভেবেই এই আহ্বান, এই আকুতি উচ্চারিত হয়।

প্রসঙ্গত বলতে হয়, কড়া জনগোষ্ঠীর ইতিহাস তাদের শ্রমনির্ভর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ‘কড়া’ শব্দের অর্থই হল মাটি খোঁড়া। গোত্রপ্রধান জগেনের কথায়, - “কড়া মানে মাটি খোঁড়া।”^৭

এই পরিচয়ের ভেতরেই লুকিয়ে আছে তাদের সামাজিক অবস্থান ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা। ব্রিটিশ আমলে রেললাইন স্থাপনের সময় পাহাড় কাটা, মাটি খোঁড়া ও কঠিন শারীরিক শ্রমের কাজ করেছিল এই জনগোষ্ঠীর মানুষ। কাজের সূত্রে তারা নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে ভিনদেশে এসে বসতি গড়ে তোলে। জীবিকার তাগিদে বাস্তুচ্যুত এই জনগোষ্ঠী ধীরে ধীরে উত্তরবঙ্গের মাটিতে শিকড় গেড়ে বসে। বর্তমানে কড়া জনগোষ্ঠীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে এসেছে। আধুনিক শিক্ষা, শহরমুখী জীবনধারা ও মূল সমাজে মিশে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছে। অথচ এই জনগোষ্ঠীর লোককাহিনি ও বিশ্বাস মানবসভ্যতার প্রাচীন স্মৃতির বাহক। সূর্যগ্রহণ নিয়ে তাদের বিশ্বাস সেই প্রাচীন স্মৃতির অন্যতম নিদর্শন। কড়াদের লোককাহিনি অনুযায়ী, দুর্ভিক্ষের সময় সূর্য ও চন্দ্র মানুষের জন্য ধান ধার করে আনে দেবতা দোসাদের কাছ থেকে। কিন্তু মানুষ সে ধার শোধ করতে ব্যর্থ হয়। প্রবীণ সেড়তির ভাষায়, -

“দোসাদ দেবতা এখনো সুযোগ পেলেই চন্দ্র ও সূর্যকে আক্রমণ করে।”^৮

এই আক্রমণ থেকেই গ্রহণের সৃষ্টি হয় বলে তারা বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসে গ্রহণ কোনো অশুভ ঘটনা নয়, বরং মানুষের নৈতিক দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়ার এক প্রতীক।

কড়া জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সম্পূর্ণ মৌখিক ধারায় প্রবাহিত। তাদের ভাষা, গান ও গল্প লিখিত আকারে সংরক্ষিত নয়। মায়ের মুখে শোনা ঘুমপাড়ানি গান, বাবার আদরের ডাক ও প্রবীণদের গল্পই তাদের শিক্ষা। সুনিয়া কড়ার কণ্ঠে ঘুমপাড়ানি গানে শোনা যায়, -

“ইয়ারে ডিম চড়ওয়া ডিমা পার দে।”^৯

এই গানের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির পাখি, শিশুর ঘুম ও মাতৃত্বের অনুভূতি একাকার হয়ে যায়। এখানে লোকগান কেবল বিনোদন নয়, বরং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহনের মাধ্যম। একথা মনে রাখতে হবে যে, -

“গান হল মনের ভাবনা। মানুষ যখন বিরাট কোনও শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সাধারণভাবে, কথাবার্তা বলার মাধ্যমে সেই ভাবনাকে বোঝানো যায় না, তখনই আসে গান-ঠিক শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো স্বচ্ছন্দে। তখন ভাবনার টুকরোগুলো স্রোতের জলে-ভাসা বরফকুচির মতো এদিক-ওদিক যেতে চায়। আনন্দ হলে, ভয় ধরলে, দুঃখ পেলে মানুষের ভাবনারা একটা শক্তির প্রবাহে বয়ে চলে। যেন বানভাসি হয়ে মানুষ সেইসব ভাবনার বেগে এগিয়ে যায়, তার হাঁফ ধরে, বুক টিপটিপিয়ে ওঠে। চারিদিকের জলহাওয়ার মধ্যে থেকে কী একটা যেন এসে তাকে থ’ বানিয়ে রাখে। আমরা তো সব সময়েই যেন নিজেদেরকে খুব তুচ্ছ বলে ভাবি; ঐসব সময়ে যেন আরও তুচ্ছ বলে মনে হয় নিজেকে। কথার ব্যবহারে তখন ভয় ধরে বটে, কিন্তু কথারা তখন আপনাআপনিই এসে যায়। যে কথাগুলো মেলে ধরতে চাই, সেগুলোই তখন নিজেরা গানের মূর্তিতে হাজির হয়।”^{১০}

এই পরিপ্রেক্ষিতে আদিবাসীদের জীবনে গানের ভূমিকা আর তাঁর সৃষ্টির স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। একই সঙ্গে লোকগাথার গুরুত্ব ও তাৎপর্য।

তাই লোকবিশ্বাস, লোকগাথার অনুসন্ধানে আদি মানুষের গানের এক গভীর গুরুত্ব রয়েছে। ওঁরাও জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসে সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান আরও ভিন্ন মাত্রা পায়। তারা সূর্যকে ‘বিড়ি নাদ’ ও চন্দ্রকে ‘চান্দু নাদ’ নামে দেবতা হিসেবে পূজা করে। ওঁরাওদের সৃষ্টি-কাহিনিতে আকাশ, পৃথিবী ও আলো এক নাটকীয় রূপে আবির্ভূত হয়। নিপেন টিগ্লা যখন বলেন, -

“মহুয়া গাছের আলোতেই পৃথিবী আলোকিত থাকত।”^{১১}

তখন সেই বক্তব্যে শুধু একটি কাহিনি নয়, বরং প্রকৃতি নির্ভর জীবন-দর্শনের প্রতিফলন ঘটে। মল্লয়া গাছ, চিল পাখি ও মানুষের আত্মবলিদানের কাহিনির মধ্যদিয়ে আলো ও অন্ধকারের চিরন্তন দ্বন্দ্ব ফুটে ওঠে।

সাঁওতাল সমাজে সূর্য পূজার ধারণা আরও সুসংহত ও সাংগঠনিক। তারা সূর্যকে ‘সিং বোঙ্গা’ নামে অভিহিত করে এবং পূর্বদিককে পবিত্র বলে মানে। নিজেদের তারা ‘হর’, অর্থাৎ মানুষ বলে পরিচয় দেয়, যা তাদের মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। সাঁওতালদের লোকগাথায় তীর-ধনুক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। এটি শিকার, আত্মরক্ষা ও অধিকার আদায়ের অস্ত্র। রানির প্রতিহিংসা ও রাজার প্রাণরক্ষার কাহিনিতে যে ফুলটির নাম উঠে আসে, তা হল –

“কারি নাগিন হাড় বাহা।”^৮

এই কাহিনি নৈতিক শিক্ষা দেয় যে সত্য ও জ্ঞান শেষ পর্যন্ত অন্যায়কে পরাজিত করে। অন্যায় হয়তো নাছোড়বান্দা হয়ে ওঠে কখনো কখনো, কিন্তু শেষপর্যন্ত তার পরাজয় হয়, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয়, জয় হয় সত্যের ও সুন্দরের। এটাই সমাজের বিশ্বাস, সেই আদিকাল থেকে চলে আসছে।

চন্দ্র ও সূর্য ওঁরা ওদের দেবতা। ওঁরাও ভাষায় বিড়ি নাদ ও চান্দু নাদ। চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি নিয়ে তাদের বিশ্বাসে আছে প্রাচীন এক কাহিনি। আধো কুরুক ও আধো বাংলায় নিপেন বলতে শুরু করলেন কাহিনিটি – ধরমেশ যখন পৃথিবী সৃষ্টি করল তখন আকাশ ও মাটি ছিল খুবই কাছাকাছি। মানুষ চলাফেরা করার সময় আকাশ মাথায় ঠেকত। একবার মানুষের কোনো এক অপরাধে আকাশ ওপরে উঠে গেল। এতে চলাফেরায় মানুষের সুবিধা হলেও সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল।

বনের মধ্যে ছিল এক মল্লয়া গাছ। সে-গাছে ফুল যতক্ষণ ফুটে থাকত ততক্ষণ পৃথিবী আলোকিত থাকত। আর যখন ফুল শুকিয়ে যেত তখন আবার অন্ধকার নেমে আসত। সবাই ভাবল, গাছটিই অন্ধকারের মূল কারণ। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল গাছটিকে কেটে ফেলে আলো উদ্ধারের। গাছটি কাটা হল; কিন্তু তারপরও সেটি মাটিতে পড়ছে না। দৈববাণীর মাধ্যমে জানা গেল, গাছটিতে রয়েছে চিলের বাসা। চিলটিকে না মারলে গাছটি মাটিতে পড়বে না। তাই হল, চিলটিকে মারার পরপরই গাছটি মাটিতে পড়ে গেল। পড়ার শব্দে কেঁপে উঠল গোটা পৃথিবী।

সে-দেশের রাজা ভাবলেন, শত্রুরা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেছে। তিনি সৈন্য নিয়ে এসে দেখলেন মল্লয়া গাছটি কাটা। রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে শান্তির হুকুম দিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে চলল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। রাজার সৈন্য পরাজিত হল। অতঃপর গাছটিকে দু-ভাগ করে কাটা হল। দেখা গেল নিচের দিকের বড় অংশটিতে সূর্য আর ওপরের দিকের ছোট অংশটিতে চন্দ্র। কিন্তু তাদের জীবনদান হবে কীভাবে?

আবারো দৈববাণী এলো। এক চাষির আদরের ছেলেকে চুরি করে এনে হত্যা করে তার রক্ত ঢেলে দেওয়া হলো গাছের কাটা অংশে। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্র ও সূর্য জীবিত হয়ে আকাশে উঠে গেল।

সে-সময় থেকেই ওঁরাওরা মনে করে সূর্য পুরুষ এবং সে বেশি রক্ত পান করেছিল বলে তেজি ও লাল। একই ভাবে চন্দ্র মহিলা এবং সে কম রক্ত পান করেছিল বলে স্নিগ্ধ ও সাদা। ওঁরাও গ্রামের পাশেই নিপেন দেখিয়ে দিলেন সাঁওতালপাড়াটি। এ-পাড়াতেই ঐতিহাসিক পাড়ু রাজার বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল।

প্রাথমিক সালেহ খোকন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখতে লিখতে জানিয়েছেন, -

“পাড়ার ভেতর ঢুকতে ঢুকতে মনে পড়ল সাঁওতালদের বিষয়গুলো। তারা নিজেদের ‘সানতাল’ বলতেই অধিক পছন্দ করে। নিজেদের মধ্যে তারা একে অপরকে ডাকে ‘হর’ বলে। ‘হর’ অর্থ ‘মানুষ’। তাদের আদি দেবতা সূর্য। সাঁওতালি ভাষায় ‘সিং বোঙ্গা’। সূর্য পূর্বদিকে উঠে বলেই পূর্বদিক সাঁওতালদের কাছে পবিত্র। তাই পূজাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা পূর্বদিকে মুখ করে বসে। নানা বিশ্বাসের প্রভাবে তাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে নানা আচার। তারই ধারাবাহিকতায় চলছে এই গ্রহণমুক্তির চেষ্টা। কেন এই সূর্যগ্রহণ হয় – সে-বিষয়ে অন্য আদিবাসীদের মতো কড়াদের রয়েছে আদি বিশ্বাস ও কাহিনি। ৯০ বছরের সেড়তি কড়া কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে শুরু করলেন সে-কাহিনি। মানব জাতি একবার খুবই অভাবের মধ্যে পড়ে। মানব জাতিকে বাঁচানোর জন্য চাই ধান। চন্দ্র এবং সূর্য মানুষের জন্য ধান দিতে

অনুরোধ করে দোসাদ দেবতাকে। তাদের প্রার্থনায় সম্ভূষ্ট হয়ে দোসাদ দেবতা ধান দেয় মানুষকে, তবে আবার ফেরত দিতে হবে এই শর্তে। কিন্তু সে-বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে মানব জাতি সে-ধার আর পরিশোধ করতে পারে না। চন্দ্র ও সূর্য মানব জাতির পক্ষে সেই ধান ধার নিয়েছিল বলে দোসাদ দেবতা এখনো সুযোগ পেলেই চন্দ্র ও সূর্যকে আক্রমণ করে। এতে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ ঘটে।’ এ-কারণেই কড়ারা মনে করে, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময় মানব জাতির দায়িত্ব তাদের বাঁচাতে ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করা।”^৯

এ প্রসঙ্গে আলোচনার একটি অংশ উপস্থাপন করা যেতে পারে - “এখনো শিকারসহ যে-কোনো অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রামে আদিবাসীদের একমাত্র অস্ত্র তীর-ধনুক। এছাড়া নানা পূজা-পার্বণেও তারা তীর-ধনুক ব্যবহার করছে পূর্বপুরুষদের আমল থেকে। শিকারসহ তীর-ধনুকের ব্যবহার নিয়ে প্রচলিত আছে একটি কাহিনি। গোত্রের যাটোর্থ রাগদা হেমব্রন গল্পের ছলে বলতে থাকলেন কাহিনিটি -

সাঁওতাল রাজা তখভনের রানির এক গোপন প্রেমিক ছিল। প্রেমিকটি বনের মধ্যে থাকত সর্পরাজের বেশ ধরে। রাজা যখন শিকারে যেতেন রানি তখন তাকে জঙ্গলের বিশেষ একটি দিকে যেতে নিষেধ করতেন। একবার শিকার করতে গিয়ে কৌতূহলবশত রাজা ওই বিশেষ দিকে যান এবং সর্পরাজকে দেখতে পান। নিজের প্রাণরক্ষার্থে তীর দিয়ে রাজা হিংস্র সর্পরাজকে মেরে ফেলেন। শিকার থেকে ফিরে রাজা ঘটনাটি রানিকে খুলে বলেন। সর্পরাজের মৃত্যুর কথা শুনে রানি ভেতরে ভেতরে বেশ ব্যথিত ও প্রতিহিংসা পরায়ণা হয়ে ওঠেন। তিনি রাতের আঁধারে জঙ্গলে গিয়ে সেখান থেকে সর্পরাজের হাড়গোড় কুড়িয়ে এনে বাগানে পুঁতে রাখেন। কিছুদিন পর ওই জায়গা থেকে একটি গাছ হয় এবং ওই গাছে একটি আধফোটা ফুল সারা বাগানকে আলোকিত করে তোলে।

প্রতিহিংসাপরায়ণ রানি একবার কৌশলে রাজার সঙ্গে মেতে ওঠেন সর্বনাশা বাজির খেলায়। রাজা যদি বাগানের সব ফুলের নাম বলতে না পারেন, তবে রানির হুকুমে প্রজারা রাজার প্রাণদণ্ড দেবে। নিজের বাগানের ফুলের নাম বলাটা খুবই সহজ ভেবে আত্মবিশ্বাসী রাজা রাজি হলেন। অতঃপর গ্রামে গ্রামে ঢোল পিটিয়ে এ-খবর সর্বত্র জানিয়ে দেওয়া হলো। নির্দিষ্ট দিনে রাজ্যের প্রজারা ‘বাজি খেলা’ দেখার জন্য রাজপ্রাসাদের বাগানে উপস্থিত হল। রাজা একে একে সব ফুলের নাম বলতে পারলেন; কিন্তু অদ্ভুত, আধফোটা ফুলটির কাছে এসে রাজা আটকে গেলেন। সে-সময় রাজার পক্ষের প্রজারা রানির কাছ থেকে আরো সাতদিন সময় চেয়ে নেয়। খবর পেয়ে রাজাকে বাঁচাতে অন্য রাজ্য থেকে পায়ে হেঁটে রওনা হন রাজার এক বোন। হাঁটতে হাঁটতে ষষ্ঠ রাতে তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন একটি শিমুলগাছের তলায়। হঠাৎ গভীর রাতে বোনটি শুনতে পান গাছের মগডালে এক শকুনি তার ক্ষুধার্ত বাচ্চাদের সাঙ্ঘনা দিচ্ছে এই বলে, পরদিনই সে বাচ্চাদের রাজার দেহের মাংস খাওয়াবে। উৎসুক বাচ্চারা কীভাবে তা সম্ভব মায়ের কাছে জানতে চাইলে গল্পছলে বাচ্চাদের ঘুম পাড়াতে পাড়াতে সব ঘটনা এবং ফুলের নাম ও জন্মবৃত্তান্ত খুলে বলল শকুনি। শিমুলগাছের নিচে বসে রাজার বোনটি সব কথা শুনে ফেললেন। ভোরের মধ্যেই বোন রাজার কাছে পৌঁছে ফুলের নামসহ সব ঘটনা বললেন। সাতদিনের দিন রাজা প্রজা ও রানির সম্মুখে বললেন, ফুলের নাম হল, ‘কারি নাগিন হাড় বাহা’ আর তখনই ফুলটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত হলো। আর প্রাণদণ্ড থেকে মুক্তি পেলেন রাজা।

কিন্তু ক্ষুধা প্রজারা প্রতিহিংসাপরায়ণা রানিকে তীর মেরে ঝাঁঝরা করে দিলো এবং তাতেও তাদের ক্ষোভ প্রশমিত না হওয়ায় লাঠির আঘাতে রানির মাথা গুঁড়িয়ে দিলো।”^{১০}

সাঁওতালদের সৃষ্টি-বিশ্বাসেও পরিবেশচিত্তার গভীর দিক ফুটে ওঠে। পৃথিবী সৃষ্টিতে কেঁচো ও কচ্ছপের ভূমিকা তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশ্বাস আধুনিক পরিবেশবাদী ধারণার সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে ক্ষুদ্র প্রাণীকেও বাস্তুতন্ত্রের অপরিহার্য অংশ হিসেবে দেখা হয়।

তুরি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে সূর্যগ্রহণের চেয়ে কারমা পূজার গুরুত্ব বেশি। কারমা পূজা তাদের সামাজিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। এই পূজাকে ঘিরে পারিবারিক পুনর্মিলন, গান ও নৃত্যের মাধ্যমে তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় নতুন করে প্রকাশ পায়। বাসন্তি বালার গানে শোনা যায়, -

“কাশি ফুলা ফুটেই গেলে, আসা মরা লাগি গেলে।”^{১১}

এই গান নারীর মনোজগত, বাবার বাড়ির প্রতি টান ও গ্রামীণ জীবনের আবেগকে গভীরভাবে তুলে ধরে। তুরি সমাজে লোকচিকিৎসা ও বিশ্বাসের অংশ। সাপের বিষ নামানোর মন্ত্রে উচ্চারিত হয়, -

“নাব বিষ নাব, বত্রিশে গড়ে গড়ে নাব।”^{১২}

এই মন্ত্রে ধর্ম, চিকিৎসা ও সংস্কৃতির এক সমন্বিত রূপ দেখা যায়।

পরিশেষে বলতে হয়, দিনাজপুর অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকগাথা, বিশ্বাস ও আচারানুষ্ঠান আমাদের জাতিগত ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আধুনিক শিক্ষা ও নগরায়ণের চাপে এই সংস্কৃতিগুলো দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই লোকগাথাগুলো হারিয়ে গেলে আমরা হারাবো আমাদের ইতিহাসের এক প্রাচীন স্তর, যেখানে মানুষ ও প্রকৃতি একসঙ্গে বেঁচে থাকার পথ খুঁজে পেয়েছিল। আদিবাসী লোকগাথার সংরক্ষণ তাই শুধু নৃ-গবেষণার বিষয় নয়, বরং সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় রক্ষার একটি জরুরি দায়িত্ব। আসলে সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় রক্ষার দায়িত্ব সমগ্র জাতির উপর অর্পিত হয়েছে, এটা একচেষ্টার বিষয় নয়, বিষয়টি সমষ্টিগত চেষ্টার বিষয়।

Reference:

১. সেনগুপ্ত, পল্লব, আদিবাসী মানুষের গান, ‘স্বদেশ চর্চা লোক’, প্রণব সরকার সম্পাদিত, ২০ বর্ষ, শারদ সংখ্যা, ২০২৫
২. খোকন, সালেক, ‘আদিবাসী লোকগাথার খোঁজে’, কালি ও কলম সাহিত্যপত্রিকা, বাংলাদেশ, (ইন্টারনেট সংস্করণ থেকে গৃহীত)
৩. তদেব
৪. তদেব
৫. তদেব
৬. সেনগুপ্ত, পল্লব, আদিবাসী মানুষের গান, ‘স্বদেশ চর্চা লোক’, প্রণব সরকার সম্পাদিত, ২০ বর্ষ, শারদ সংখ্যা, ২০২৫, পৃ. ৫২-৫৩
৭. খোকন, সালেক, ‘আদিবাসী লোকগাথার খোঁজে’, কালি ও কলম সাহিত্যপত্রিকা, বাংলাদেশ, (ইন্টারনেট সংস্করণ থেকে গৃহীত)
৮. তদেব
৯. তদেব
১০. তদেব
১১. তদেব
১২. তদেব